ধ্বনি পরিবর্তন

ধ্বনি দিয়ে শব্দের দেহ নির্মিত হয়। সুতরাং ভাষাতে ধ্বনির বিশেষ ভূমিকা রয়েছে। কিন্তু ধ্বনি যেহেতু মানুষের উচ্চারণের বিষয় তাই একই ধ্বনি স্থান-কাল-ব্যক্তিভেদে ভিন্ন ভিন্ন ভাবে উচ্চারিত হয়। এই বিষয়টিকেই ব্যাকরণে ধ্বনি পরিবর্তন বলা হয়। অন্যভাবে বললে, দ্রুত উচ্চারণের ফলে অথবা ভাষার উপর আঞ্চলিক প্রভাবের কারণে ধ্বনির উচ্চারণ-পার্থক্যকে বলা হয় ধ্বনি পরিবর্তন। যেমন- 'পাঁচশ টাকা' এই কথাটি দ্রুত উচ্চারণ করলে হয় 'পাশশো টাকা', 'চ' ধ্বনিটি 'শ' ধ্বনিতে রূপান্তরিত হয়ে গেল।

ধ্বনি পরিবর্তনের কারণ

ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান কারণগুলি হল-

১) ধ্বনি পরিবর্তনের প্রধান কারণ হল বাকযন্ত্রে
আরামপ্রিয়তা। উচ্চারণের শ্রম লাঘব করার জন
ধ্বনি পরিবর্তিত হয়। যেমন- বাঘ> বাগ, মাছ
মাচ ইত্যাদি শব্দে 'ঘ', 'ছ' ইত্যাদি মহাপ্রা
ধ্বনিগুলি অল্পপ্রাণ ধ্বনিতে (গ,চ) রূপান্তরি
হয়েছে।

২) বাকযন্ত্রের ত্রুটির জন্য অনেকসময় বিকৃ
উচ্চারণ হয়ে থাকে। এটিও একধরণের ধ্বনি
পরিবর্তন।

৩) ধ্বনি পরিবর্তনের আরেকটি কারণ হল উপভাষাসম্প্রদায়গত বা আঞ্চলিক প্রভাব। যেমন, ঝাড়খণ্ডী উপভাষায় স্বতোনাসিক্যিভবনের প্রবণতা রয়েছে। সেইজন্য ওই অঞ্চলের মানুষ হাঁসি (<হাসি), হাঁসপাতাল (<হাসপাতাল) করে থাকে।

৪) কঠিন শব্দকে সহজভাবে উচ্চারণ করার বাসনায় বা বৃহৎ শব্দকে ক্ষুদ্রাকারে উচ্চারণ করার প্রয়াসের ফলে অনেক সময় ধ্বনি পরিবর্তিত হয়ে থাকে। যেমন- মাইক্রোফোন> মাইক, বউদিদি> বৌদি ইত্যাদি।

৫) ধ্বনি পরিবর্তনের ক্ষেত্রে পারিবারিক বা পারিপার্শ্বিক প্রভাবও অনেকখানি দায়ি। যেমন, অনেকেই 'র' ধ্বনিটিকে 'ড়' উচ্চারণ করে। এটি বাংলা ভাষার কোনো উপভাষাগত বৈশিষ্ট্য নয়। এমনকি একই পরিবারের সকলে 'র'-কে 'ড়' উচ্চারণ নাও করতে পারে।

ধ্বনি পরিবর্তনের ধারা

ধ্বনি প্রধানত দুই প্রকার- ১) স্বরধ্বনি এবং ২) ব্যঞ্জনধ্বনি। উভয়প্রকার ধ্বনিরই পরিবর্তন লক্ষ্য করা যায়। আবার ধ্বনি পরিবর্তনের ধরণগুলি মূলত চার প্রকারের। যথা-

» ক) ধ্বনির আগম- উচ্চারণকালে নতুন একটি বা একাধিক ধ্বনির আগমন ঘটে। যেমন- স্কুল> ইস্কুল, স্ত্রী> ইস্ত্রী ইত্যাদি।

» খ) ধ্বনির লোপ- উচ্চারণকালে একটি বা একাধিক ধ্বনি লোপ পায়। যেমন- গামোছা> গামছা, জানালা> জানলা ইত্যাদি।

» গ) ধ্বনির রূপান্তর- শব্দমধ্যস্থ কোনো ধ্বনি রূপান্তরিত হয়। যেমন- গল্প> গপ্প, শরীর> শরীল ইতাদি।

» ঘ) ধ্বনির স্থানান্তর- দ্রুত উচ্চারণের ফলে বা অসাবধানতাবশত পাশাপাশি থাকা দুটি ধ্বনি একটির জায়গায় আরেকটি উচ্চারিত হয়। যেমন- রিকশা> রিশকা, মুকুট> মুটুক ইত্যাদি।

যাইহোক, মনে রাখার সুবিধার জন্য আমরা ধ্বনি পরিবর্তনের রীতিগুলিকে যথাক্রমে স্বরধ্বনিগত এবং ব্যঞ্জনধ্বনিগত এই দুই ভাগে আলোচনা করব।

ধ্বনি পরিবর্তন [স্বরধ্বনিগত]

১) **অপিনিহিতি** (Epenthesis) -অপিনিহিতি কথাটির অর্থ হল আগে (অপি) অবস্থান করা (নিহিতি)। উচ্চারণকালে যদি শব্দমধ্যস্থ 'ই'-কার বা 'উ'-কার নির্দিষ্ট সময়ের আগে উচ্চারিত হয় তবে ব্যাকরণের আলোচনায় ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিটিকে বলা হয় অপিনিহিতি। এই নামটি ভাষাচার্য সুনীতিকুমার চট্টোপাধ্যায়ের দেওয়া। এই বিশেষ উচ্চারণ রীতি বঙ্গালি উপভাষার লক্ষণ। সাধারণত 'ই' এবং 'উ'- কারের অপিনিহিতি হয়ে থাকে। যেমন- সাধু> সাউধ, দেখিয়া> দেইখ্যা ইত্যাদি।

২) **অভিশ্রুতি** (Umlaut/ Vowel Mutation) – অপিনিহিতির পরের স্তর হল অভিশ্রুতি। অপিনিহিতিজাত 'ই' এবং 'উ' সন্নিহিত স্বরধ্বনির প্রভাবে অন্য রূপ লাভ করলে ব্যাকরণের আলোচনায় ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিটিকে বলা হয় অভিশ্রুতি। যেমন-

– করিয়া (মূল শব্দ)> কইর‍্যা(অপিনিহিতি)> করে (অভিশ্রুতি),

– বলিয়া (মূল শব্দ) > বইল্যা (অপিনিহিতি)> বলে (অভিশ্রুতি) ইত্যাদি।

৩) **স্বরসঙ্গতি** (Vowel Harmony)-শব্দের মধ্যে একাধিক স্বরধ্বনি থাকলে উচ্চারণকালে তারা একে অপরকে প্রভাবিত করে সঙ্গতি বিধানের চেষ্টা করে। এইভাবে যে ধ্বনি পরিবর্তন হয় তাকে স্বরসঙ্গতি বলা হয়। যেমন- পুজা> পুজো, কুমড়া> কুমড়ো ইত্যাদি। অভিশ্রুতি দুই রকমের হয়-

ক) **প্রগত স্বরসঙ্গতি**– পূর্ববর্তী স্বরের প্রভাবে যখন পরবর্তী স্বরধ্বনি প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়ে স্বরসঙ্গতি রক্ষা করে, তখন তাকে প্রগত স্বরসঙ্গতি বলা হয়। যেমন-

পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে 'আ' ধ্বনি 'ও' হয়- বুড়া> বুড়ো, মূলা> মূলো, তুলা> তুলো, ধূলা> ধূলো, রূপা> রূপো ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে 'আ' ধ্বনি 'এ' হয়- বিকাল> বিকেল, হিসাব> হিসেব, মিঠা> মিঠে, বিনা> বিনে, চিড়া> চিড়ে, দিয়ে> দিয়ে ইত্যাদি।

পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে 'আ' ধ্বনি 'ই' হয়- বিলাতি> বিলিতি, ভিখারি> ভিখিরি ইত্যাদি।

খ) **পরাগত স্বরসঙ্গতি**– পরবর্তী স্বরধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী স্বরধনি প্রভাবিত বা পরিবর্তিত হয়ে স্বরসঙ্গতি রক্ষা করলে তাকে পরাগত স্বরসঙ্গতি বলা হয়। যেমন-

পরবর্তী 'আ' ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'উ' ধ্বনি 'ও' হয়ঃ- শুনা> শোনা, ভুলা> ভোলা, উঠা> ওঠা ইত্যাদি।

পরবর্তী 'আ' ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'ই' ধ্বনি 'এ' হয়ঃ- মিলা> মেলা, মিশা> মেশা, শিখা> শেখা ইত্যাদি।

পরবর্তী 'ই' ধ্বনির প্রভাবে পূর্ববর্তী 'এ' ধ্বনি 'ই' হয়ঃ- দেশি> দিশি, একি> ইকি, বেটি> বিটি ইত্যাদি।

৪) **স্বরাগম**– উচ্চারণকালে শব্দের মধ্যে নতুন একটি স্বরধ্বনির আগমন ঘটলে যে ধরনের ধ্বনি পরিবর্তন হয় ব্যাকরণের পরিভাষায় তাকে স্বরাগম বলে। স্বরাগম তিন প্রকার-

» **আদি স্বরাগম**– উচ্চারণের সুবিধার্থে শব্দের আদিতে অর্থাৎ শুরুতে স্বরধ্বনির আগমন ঘটার প্রক্রিয়াকে বলা হয় আদি স্বরাগম। যেমন- স্কুল> ইস্কুল, স্কেল> ইস্কেল, স্ত্রী> ইস্ত্রী ইত্যাদি।

» **মধ্য স্বরাগম**– শব্দের মাঝখানে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে বলা হয় মধ্য স্বরাগম। যেমন- মুক্তা> মুকুতা, রত্ন> রতন ইত্যাদি।

» **অন্ত্য স্বরাগম**– শব্দের অন্ত্যে বা শেষে স্বরধ্বনির আগম ঘটলে তাকে অন্ত্য স্বরাগম বলা হয়। যেমন- সত্য> সত্যি, নস্য> নস্যি ইত্যাদি।

এই তিন প্রকার স্বরাগমের মধ্যে মধ্যস্বরাগম বিশেষভাবে উল্লেখযোগ্য। মধ্যস্বরাগমের অপর নাম **স্বরভক্তি** বা **বিপ্রকর্ষ**। স্বরভক্তি শব্দের আক্ষরিক অর্থ হল স্বর সহযোগে বিভাজন। যুক্তাক্ষরের মাঝে স্বরধনির আগম ঘটলে তাকে স্বরভক্তি বলা হয়। স্বরভক্তির ফলে শব্দের উচ্চারণ যেমন সহজতর হয় তেমনি শব্দটি শ্রুতিমধুর হয়ে ওঠে। এইজন্য কাব্যে স্বরভক্তির বিশেষ ব্যবহার লক্ষ্য করা যায়। এর অপর নাম বিপ্রকর্ষ। বিপ্রকর্ষ কথাটির অর্থ হল বিশেষভাবে প্রকৃষ্টরূপে সৌকর্য সৃষ্টি। ধ্বনি পরিবর্তনের আলোচনায় বিপ্রকর্ষ বলতে বোঝায় কোনো যুক্তাক্ষরের মাঝে স্বরধ্বনির আগমের ফলে যুক্ত ব্যঞ্জনগুলির দূরবর্তী হওয়া। স্বরভক্তির উদাহরণ- কর্ম> করম, ধর্ম> ধরম, জন্ম> জনম, মুক্তা> মুকুতা, মুল্ক> মুলুক ইত্যাদি।

৫) **স্বরলোপ**– উচ্চারণের সুবিধার জন্য শব্দমধ্যস্থ স্বরধ্বনি লোপ পেলে ব্যাকরণের ভাষায় তাকে বলা হয় স্বরলোপ। স্বরলোপ তিন প্রকারের হয়-

ক) **আদি স্বরলোপ**– শব্দের আদিতে স্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ ঘটলে তাকে আদি-স্বরলোপ বলা হয়। যেমন- উড়ুম্বুর> ডুমুর, অলাবু> লাউ ইত্যাদি।

খ) **মধ্য স্বরলোপ**– শব্দের মধ্যে স্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ ঘটলে তাকে মধ্য স্বরলোপ বলা হয়। যেমন- গামোছা> গামছা, ভগিনী> ভগ্নি, বসতি> বস্তি ইত্যাদি।

গ) **অন্ত্য স্বরলোপ**– শব্দের অন্তে বা শেষে স্থিত স্বরধ্বনির বিলোপ ঘটলে তাকে অন্তঃস্বরলোপ বলা হয়। যেমন- রাশি> রাশ।

৬) **নাসিক্যীভবন**– শব্দমধ্যস্থ নাসিক্য ধ্বনি (ঙ, ঞ, ণ, ন, ম) লোপ পাওয়ার ফলে পূর্ববর্তী স্বরধ্বনির সানুনাসিক উচ্চারণ হয়। ধ্বনি পরিবর্তনের এই রীতিকে বলা হয় নাসিক্যীভবন (Nasalization)। যেমন- পঞ্চ> পাঁচ, চন্দ্র> চাঁদ, পঙ্ক> পাঁক ইত্যাদি।

নাসিক্য ব্যঞ্জনধ্বনির প্রভাব ছাড়াই যখন কোনো স্বরধ্বনির আনুনাসিক উচ্চারণ হয়, তখন তাকে **স্বতোনাসিক্যীভবন** বলা হয়। যেমন- আখ> আঁখ, আচ>আঁচ, হাসপাতাল> হাঁসপাতাল, ইট> ইঁট, পুথি> পুঁথি ইত্যাদি।

ধ্বনি পরিবর্তন [ব্যঞ্জনধ্বনিগত]

১) **ব্যঞ্জনাগম**– শব্দের শুরুতে, মাঝে বা শেষে ব্যঞ্জন ধ্বনির আগম ঘটলে ধ্বনি পরিবর্তনের এই নিয়মকে বলা হয় ব্যঞ্জনাগম। যেমন- উজু> রুজু (শুরুতে), বানর> বান্দর (মাঝে), নানা> নানান (শেষে)। এই প্রসঙ্গে শ্রুতিধ্বনির উল্লেখ করা প্রয়োজন।

শ্রুতিধ্বনি- অনেকসময় পাশাপাশি অবস্থিত দুটি স্বরধ্বনির উচ্চারণগত আড়ষ্টতা দূর করার জন্য একটি অতিরিক্ত 'য়' বা 'ব' ধ্বনির আগম ঘটে। শ্রুতিমাধুর্য সৃষ্টির জন্য যে ধ্বনির আগম ঘটে তাকে শ্রুতিধ্বনি বলা হয়। যেমন- দু-এক> দুয়েক, কে এলো> কেয়েলো ('য়' শ্রুতি) এবং খাআ> খাবা> খাওয়া, দেআ> দেবা> দেওয়া ('ব' শ্রুতি) ইত্যাদি।

২) **ব্যঞ্জনলোপ**– উচ্চারণকালে শব্দের শুরুতে, মাঝে বা শেষে কোনো ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে ধ্বনি পরিবর্তনের এই নিয়মকে বলা হয় ব্যঞ্জনলোপ।

» আদি-ব্যঞ্জনলোপ- শব্দের আদিতে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে আদি-ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন- স্ফটিক> ফটিক, স্ফূর্তি> ফুর্তি, স্থান> থান , শ্রাবণ> শাবন (শাওন) ইত্যাদি।

» মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ- শব্দের মধ্যে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে মধ্য-ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন- নবনী> ননী, মজদুর> মজুর, ফাল্গুন> ফাগুন, গোষ্ঠ> গোঠ ইত্যাদি।

» অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ- শব্দের শেষে থাকা ব্যঞ্জনধ্বনি লোপ পেলে তাকে অন্ত্য-ব্যঞ্জনলোপ বলা হয়। যেমন- আলোক> আলো, মধু> মউ, গাত্র> গা, সখী> সই, কুটুম্ব> কুটুম ইত্যাদি।

অন্যান্য ব্যঞ্জনধ্বনি লোপের তালিকায় রয়েছে-

'হ' ধ্বনি লোপ- কথ্য উচ্চারণে বা চলিত ভাষায় কোনো শব্দের 'হ' ধ্বনি লোপ পেলে ধ্বনি পরিবর্তনের আলোচনায় এই রীতিকে বলা হয় 'হ' ধ্বনি লোপ। যেমন- মহাশয়> মশায়, সিপাহি> সিপাই, মালদহ> মালদা ইত্যাদি। সাধু ভাষার সর্বনামগুলি থেকেও 'হ' ধ্বনি লোপ পায়। যেমন- তাহার> তার, যাহার> যার ইত্যাদি।

'র' ধ্বনি লোপ- কথ্য উচ্চারণে মূল শব্দের 'র' ধ্বনিটি লোপ পেলে তাকে 'র' ধ্বনির লোপ বলা হয়। যেমন- কার্পাস> কাপাস ইত্যাদি। অনেক সময় 'র' ধ্বনিটি লোপ পেলে পরের ব্যঞ্জন ধ্বনিটি দুবার উচ্চারিত হয়। যেমন- করল> কল্ল, সর্দার> সদ্দার ইত্যাদি।

সমাক্ষরলোপ- পাশাপাশি থাকা দুটি সমধ্বনির একটি লোপ পেলে তাকে সমাক্ষর লোপ বলে। যেমন- ঠাকুরদাদা> ঠাকুরদা, বড়দাদা> বড়দা ইত্যাদি।

৩) **সমীভবন**– উচ্চারণের সুবিধার জন্য কোনো শব্দের পাশাপাশি থাকা দুটি ভিন্ন ভিন্ন ব্যঞ্জনধ্বনি যখন প্রথম ধ্বনিটি পরের ধ্বনিটিকে, অথবা পরের ধ্বনিটি আগের ধ্বনিটিকে, অথবা একে অপরকে প্রভাবিত ও পরিবর্তিত করে, তখন তাকে সমীভবন বা সমীকরণ (Assimilation) বলা হয়। প্রথম ক্ষেত্রে হয় প্রগত (Progressive) সমীভবন, দ্বিতীয় ক্ষেত্রে হয় পরাগত (Regressive) সমীভবন এবং তৃতীয় ক্ষেত্রে হয় অন্যোন্য (Mutual) সমীভবন। যেমন-

» প্রগত সমিভবন- পদ্ম> পদ্দ, চন্দন> চন্নন, গলদা> গল্লা ইত্যাদি।

» পরাগত সমীভবন- গল্প> গপ্প, কর্তা> কত্তা, ধর্ম> ধম্ম ইত্যাদি।

» অন্যোন্য সমীভবন- বৎসর> বচ্ছর, মহোৎসব> মোচ্ছব, মৎস্য> মচ্ছ ইত্যাদি।

৪) **বিষমীভবন**– পাশাপাশি অবস্থিত দুটি সমব্যঞ্জনধ্বনির একটি পরিবর্তিত হয়ে ধ্বনি বৈষম্যের সৃষ্টি করলে ধ্বনি পরিবর্তনের ভাষায় তাকে বিষমীভবন বা অসমীকরণ (Dissimilation) বলা হয়। যেমন- শরীর> শরীল, লাল> নাল ইত্যাদি।

৫) **ধ্বনি বিপর্যয়**– দ্রুত উচ্চারণের ফলে অথবা অজ্ঞতাবশত শব্দমধ্যস্থ দুটি ব্যঞ্জনধ্বনি পরস্পর স্থান পরিবর্তন করলে, ধ্বনি পরিবর্তনের সেই রীতিকে বলা হয় ধ্বনি বিপর্যয় (Metathesis)। যেমন- রিকশা> রিশকা, মুকুট> মুট্টুক, আলনা> আনলা, বারাণসী> বানারসি, বাক্স> বাস্ক, পিশাচ> পিচাস, তলোয়ার> তরোয়াল, রিস্ক> রিকস ইত্যাদি।

সমমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Convergent Phonemic Change) : ধ্বনি-পরিবর্তনের ফলে যদি একাধিক শব্দ পরিবর্তিত হয়ে উচ্চারণ ও বানানে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করে তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে সমমুখ ধ্বনি-পরিবর্তন (Convergent Phonemic Change) বলে। যেমন—সংস্কৃত পততি >বাংলা পড়ে (falls), সংস্কৃত পঠতি>বাংলা পড়ে (reads)। এখানে দু'টি শব্দ 'পততি' ও 'পঠতি' ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে সম্পূর্ণ একই রকম রূপ লাভ করেছে–'পড়ে'। তেমনি সখী>সই, সহি>সই ; ব্যাকুল>বাউল, বাতুল>বাউল। এই ধরনের পরিবর্তনের ফলে শব্দগুলি যে রূপ লাভ করে তাকে সমরূপ শব্দ (Homonym) বলে। ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক শব্দের পরিবর্তিত রূপ যদি ধ্বনির দিক থেকে অর্থাৎ উচ্চারণের দিক থেকে একই রকম হয়ে যায়, শুধু লেখার বানানে পৃথক্ থাকে তবে সেই পরিবর্তিত রূপকে সমোচ্চারিত বা সমধ্বনি শব্দ (Homophone) বলে। যেমন—শ্রবণ>শোনা [ʃona], সুবর্ণ>সোনা [ʃona]। এরকম ঐতিহাসিক সমমুখ পরিবর্তন ছাড়াও যদি দেখা যায় যে দু'টি শব্দের মধ্যে উচ্চারণগত বা ধ্বনিগত মিল আছে, শুধু বানান ও অর্থে পার্থক্য আছে তা হলেও সেই শব্দ দু'টিকে সমোচ্চারিত বা সমধ্বনি শব্দ (Homophone) বলে। যেমন—বন [bo:n] (=অরণ্য), বোন [bo:n] (=ভগিনী) ; বিষ [bi:ʃ] (=poison), বিশ [bi:ʃ] (=twenty) ; কুল [ku:l] (=বংশ), কূল [ku:l] (=নদীর তীর) ইত্যাদি।

বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) : একই শব্দ যদি ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে একাধিক রূপ লাভ করে অর্থাৎ ধ্বনির পরিবর্তনের ফলে যদি একই শব্দ থেকে একাধিক শব্দের জন্ম হয় তবে সেই ধরনের পরিবর্তনকে বিমুখ ধ্বনিপরিবর্তন (Divergent Phonemic Change) বলে। যেমন—ভণ্ড>ভান ও ভাঁড়, চিত্র>চিতা ও চিত্তির, শ্রদ্ধা>সাধ ও ছেদ্দা।

এভাবে যে কোনো কারণে ধ্বনিপরিবর্তনের ফলে বা এরকম পরিবর্তন ছাড়াই যদি দেখা যায় যে দু'টি শব্দের একই রকম রূপ, তা হলে সেই শব্দ দু'টিকে **যমক (Doublet)** বলে, যেমন—পড়ে (reads) ও পড়ে (falls); যদি তিনটি শব্দের একই রূপ হয় তবে তাদের **ত্রিক (Triplet)** বলে, যেমন—কর (উপাধি), কর (তুই কর), কর (ট্যাক্স্); এরকম তিনের বেশী শব্দের রূপ একই রকম হলে তাকে **গুচ্ছক (Multiplet)** বলে। যেমন—কড়া (কঠিন), কড়া (পায়ের কড়া), কড়া (রান্নার কড়া), কড়া (দরজার রিং)।